‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়’ নাকি বিশ্ববিদ্যালয়?

উচ্চশিক্ষা

শেখ নাহিদ নিয়াজী

সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

শুধু একটি শর্ত ‘স্থায়ী ক্যাম্পাসের বন্দোবস্ত’ পূরণই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকে থাকা এবং মানসম্মত শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়’ হিসেবে চিহ্নিত না করে সত্যিকার অর্থে ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ (টিচিং ইউনিভার্সিটি-রিসার্চ ইউনিভার্সিটি) হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ সবাইকে একযোগে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯২ সালে। শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভাড়া বাড়িতে-বাণিজ্যিক ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯৯২’-এর আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হতো। তখন বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিত। এমনকি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোক্তাদের ভেতর থেকেই উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ এবং রেজিস্ট্রার নিয়োগ দিত। পরে ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ২০১০’ (সংশোধনীসহ) এর মাধ্যমে ‘বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। তবুও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ২০১০’-এর আলোকে পরিচালিত হচ্ছে না এবং সে কারণেই এখন পর্যন্ত আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়মের খবর পাই। এখন প্রশ্ন হলো– গত ২৫ বছর ধরে অনিয়মগুলো কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো?

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যেসব অনিয়ম চিহ্নিত করেছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

ক. একটি নির্দিষ্ট সময় পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে না পারা; খ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছ থেকে ‘স্থায়ী সনদ’ না পাওয়া; গ. নিয়মিত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট জমা না দেওয়া; ঘ. বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের পদ খালি থাকা; ঙ. শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত না করা; চ. সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারা।

কিন্তু এসব অনিয়মের প্রশ্রয়দাতা কে বা কারা? ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ২০১০’ কি এসব অনিয়ম দূরীকরণে যথেষ্ট নয়? না হলে, কেন নয়? সমস্যা কি তাহলে ‘শর্ষের ভেতরেই ভূত?’ এখন পর্যন্ত ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় (মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫টি) স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পেরেছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী সনদপ্রাপ্ত নয়। সাম্প্রতিককালে সংবাদপত্রের খবরাখবর থেকে আমরা জানি, হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক অডিট রিপোর্ট জমা দিয়েছে। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের শূন্য পদ পূরণে খুব সচেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির অর্থ কীভাবে কোন খাতে (আয়-ব্যয়ের হিসাব) ব্যবহৃত হচ্ছে, তার কোনো সুস্পষ্ট চিত্র নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটে দৃশ্যমান নয়। গত ৬ এপ্রিল, ২০১৭ দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি কোটি টাকা লোপাট’ শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ হয়। আর এসব অনিয়ম চালু রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা আদৌ কি সম্ভব?

কিন্তু এসব অনিয়মের বাইরেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্য রকমের কিছু সমস্যা বিরাজ করছে, যেগুলো সচরাচর আমাদের আলোচনা-সমালোচনায় আসছে না। এমনকি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও এগুলোকে আলোচনার টেবিলে খুব একটা আনছে না। আজকের এই লেখায় সেই ‘অন্যরকমের সমস্যাগুলো’ চিহ্নিত করতে চাই।

১. বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুলিখিত কোনো চাকরি বিধিমালা নাই। গত ১৬ মে ২০১৭-তে ইংরেজি দৈনিক দি ইন্ডিপেন্ডেন্টে প্রকাশিত ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ৪২তম বাৎসরিক রিপোর্ট ২০১৫’-এর তথ্য অনুযায়ী মোট ১৫ হাজার ৫৮ জন শিক্ষক ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। তার মধ্যে ১০ হাজার ১৮৮ জন স্থায়ী পদে এবং চার হাজার ৮৭০ জন খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত। এর মধ্যে ৭০৮ জন অধ্যাপক, ৫৬৪ জন সহযোগী অধ্যাপক, ২১৭৮ জন সহকারী অধ্যাপক, ৬৫১২ জন প্রভাষক এবং ২২৬ জন টিচিং অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। আবার খণ্ডকালীন শিক্ষকদের মধ্যে এক হাজার ৪১০ জন অধ্যাপক, ৭৬৮ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৯১৭ জন সহকারী অধ্যাপক, এক হাজার ৫১৭ জন প্রভাষক এবং ২৫৮ জন টিচিং অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে নিয়োজিত। কিন্তু স্থায়ী পদে চাকরিরত শিক্ষকদের মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। কারণ অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো চাকরি বিধিমালা বা সার্ভিস রুল নেই। থাকলেও সেটি শিক্ষকবান্ধব তো নয়ই, বরং একপেশে ও হয়রানিমূলক। এ প্রসঙ্গে ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার সাক্ষাৎকারে (১৬ মে ২০১৭) বলেন, তারা এ রকম একটি গাইডলাইনের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন ধরেই অনুভব করছেন। এখন তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আবশ্যিক চাকরি বিধিমালা প্রণয়নে কাজ করছেন। বাস্তবতা হচ্ছে, এ রকম একটি চাকরি বিধিমালা না থাকার কারণে অনেক শিক্ষক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করে বেশ কয়েক বছর পর অন্য কোনো পেশায় চলে যাচ্ছেন। কারণ অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে থাকেন এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা এই পেশাকে স্থায়ীভাবে নিতে পারছেন না। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়মিত শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সার্ভিস পাচ্ছে না।

২. বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘চাকরি বিধিমালা’ না থাকার কারণে শিক্ষকরা তাদের চাকরিতে অনিরাপত্তায় ভোগে। এ ছাড়াও চাকরিজীবন শেষে ভবিষ্য তহবিল, গ্র্যাচুয়িটি এবং পেনশন স্কিম না থাকার কারণে শঙ্কা, অনিরাপত্তাবোধ দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলো চালু থাকলেও বেশ সীমিত আকারে রয়েছে। এমনও উদাহরণ আছে, একজন শিক্ষক (সহকারী অধ্যাপক) পাঁচ-সাত বছর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর অন্য কোনো পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করতে বাধ্য হন শুধু ভবিষ্য তহবিল, গ্র্যাচুয়িটি এবং পেনশন স্কিম না থাকার কারণে। এটি এই খাতের জন্য একটি ‘সিস্টেম লস’। কোনো কারণ না দেখিয়েই শিক্ষক ছাঁটাই করার ঘটনাও আমরা শুনে থাকি।

৩. একজন শিক্ষক প্রভাষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে সর্বশেষ কোন পদে গিয়ে চাকরি শেষ করবেন তারও সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। এমনকি বিভাগগুলোর চেয়ারম্যানের-বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন সরকারি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কিন্তু এই দায়িত্বেরও কোনো সুনির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। অনুষদগুলোর ডিন পদেরও কোনো সুনির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোতে এ রকম চিত্র দেখা যাবে, যেখানে সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই কোনো জ্যেষ্ঠ শিক্ষক (পদোন্নতি পেয়ে যিনি সহকারী অথবা সহযোগী অধ্যাপক-অধ্যাপক হয়েছেন) বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পক্ষ থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে কি-না আমরা জানি না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের (স্থায়ী পদে যারা দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত রয়েছেন) একটি বড় অংশ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার এবং দক্ষতা প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। সে কারণেই বেশ পুরনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগ এখন পর্যন্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক-লিয়েন নিয়ে আসা অধ্যাপকদের’ ওপর নির্ভর করছে এবং বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করছে। এতে করে নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভেতর থেকে ‘একাডেমিক নেতৃত্ব’ তৈরি হচ্ছে না।

শুধু একটি শর্ত ‘স্থায়ী ক্যাম্পাসের বন্দোবস্ত’ পূরণই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকে থাকা এবং মানসম্মত শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়’ হিসেবে চিহ্নিত না করে সত্যিকার অর্থে ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ (টিচিং ইউনিভার্সিটি-রিসার্চ ইউনিভার্সিটি) হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ সবাইকে একযোগে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা, স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তাসহ ভবিষ্যৎ-অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালু রাখা, অ্যালামনাই ও চাকরিদাতা-জব-মার্কেট-ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা ইত্যাদির ওপর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জোর দেওয়া প্রয়োজন।

nahidneazy@yahoo.com